বরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় প্রাক্তনী

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।"

বড় আনন্দে, বড় গর্বে অন্নদাশঙ্কর একথা লিখেছেন। মনে হয় আরও ভালো হত যদি এভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ ভাঙা বাংলার এক ভাগে না পড়ে যেতো (বঙ্গভঙ্গের ফলেই প্রেসিডেন্সি কলেজ গর্ব করে বলতে পারে যে সে দু'টি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি তৈরি করেছে, একথা মনে রেখেও), বা কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সাধারণ সম্পত্তি হত—দু বাংলারই থাকত সমান অধিকার! সমান ভাবে আমরা পেতাম কয়েকজন সারস্বত সাধককে—যাঁদের এখনও পরম শ্রদ্ধায় অশেষ অতীতচারিতায় স্মরণ করি। ভাবি যদি দেশ-বিভাগের ফলে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ মুহম্মদ কুদ্‌রত-এ-খুদার মত মানুষেরা এপার বাংলা ছেড়ে ওপারে না যেতেন! ৯ই মে, ১৯০০ (১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৬শে বৈশাখ) তাঁর জন্ম-তারিখ হওয়ায় এবছর ডঃ খুদার শতবার্ষিকী। তাই বড় বেশি করে মনে পড়ে এই বিজ্ঞানী-শিক্ষক-প্রশাসকের কথা, যাঁর প্রতিভার যোগ্য সমাদর বা পরিমাপ আজও হয়নি—কোন বাংলায়ই না।

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর কথা ভাবতে বসলে প্রথমেই যা সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করে তা হল তাঁর প্রগাঢ় ছাত্র-বাৎসল্য। ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন আর শ্রদ্ধা করতেন তাদের অনাগত ভবিষ্যৎকে। তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে তিনি ছিলেন সতত উন্মুখ। তাই তাদের এতটুকু স্খলন বা বেচাল তাঁকে আহত করত। তাঁর প্রায় সমসাময়িক (কিছুটা

মনোতোষ দাশগুপ্ত*

অনুজ) ও প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকর্মী, ইতিহাসের অধ্যাপক (পরে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষা-অধিকর্তা ও গণসেবা আয়োগের সদস্য) আবদুল ওয়াহাব মামুদ্-এর মুখে শোনা একটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি। অধ্যাপক মামুদ একদিন বিকেলে ডঃ খুদার ঘরে ঢুকেছেন। ডঃ খুদা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। দেখেন ডঃ খুদা টেবিলে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে আছেন। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে গিয়ে ডাকলেন। ডঃ খুদা মুখ তুললেন। মামুদ সাহেব সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর চোখ লাল—জলে ভেজা। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডঃ খুদা বল্লেন যে সেই বিকেলে তিনি জীবনের চরমতম আঘাত পেয়েছেন—আর তা-ও তাঁর এক ছাত্রের কাছ থেকে। আরও অবাক হয়ে অধ্যাপক মামুদ ঘটনাটা বিশদ জানতে চাইলেন। অনেক কষ্টে প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে তিনি যা বল্লেন তার নির্যাস এই যে—সেদিন বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। একটি ছাত্র—বড়বাজারে থাকে—ফেল করেছে। সে এসে নাকি অধ্যক্ষকে বলেছে যে তাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে। এ-ও জিজ্ঞেস করেছে কত টাকা দিলে তা সম্ভব। ডঃ খুদা বল্লেন, "এ কী ছাত্র আমরা তৈরি করছি—এরাই দেশের ভবিষ্যৎ?" মামুদ সাহেব তাঁকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে এই প্রথম ও মাত্র একটি ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটল ; কাজেই একে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। এ থেকেই বোঝা যায় ছাত্রদের সম্বন্ধে ডঃ খুদা কী ভাবতেন।

মামুদ সাহেবও বলেছিলেন যে ডঃ খুদার প্রতিভা ও অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। দেশ-বিভাগের পরে তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না কোথায় যাবেন। মামুদ সাহেব ও অন্য শুভানুধ্যায়ীরা অনেক বোঝান। কিন্তু শেষে একদিন ডঃ খুদা বলেন যে তিনি পাকিস্তানেই যাবেন। ওখানে তাঁর কর্মজীবন অনেক বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ। বন্ধুদের নিষেধ না শুনে পাকিস্তানেই গেলেন তিনি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশে) হল তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে আরেকটা ঘটনাও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিল। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে বা তার আগে থেকে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আমাদের তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে, তার আঁচ ডঃ খুদার গায়েও লেগেছিল। অতিরিক্ত ভাব-ও আবেগপ্রবণ হওয়ায় তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে একবার কিন্তু দুষ্কৃতীর হামলা হয়। তিনি মুসলমান—এই

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

অজুহাতে। এতে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু এঘটনা যেমন নিন্দার্হ, তেমনি একথাও ঠিক যে তখন তাঁর হিন্দু ছাত্ররাই এই হামলা প্রতিরোধ করে এবং তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। ডঃ খুদা বুঝতে পারেন নি যে এ ঘটনা একদিকে যেমন ঐ রক্ত ঝরানো দিনগুলির স্বাভাবিক ঘটনা, আবার অন্যদিকে চতুর ইংরাজের কূটচালের সফল কুফল। প্রতিটি ধর্ষণ, লুঠ ও খুনের পিছনে ঐ একই কারণ। তিনি এতে দুঃখই পেয়েছিলেন, রুখে দাঁড়াতে পারেননি, পারলে ভবিষ্যৎ এত বিয়োগান্ত হত না।

একথা বলছি এই কারণে যে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েও তিনি সুখী হতে পারেন নি। বুঝতে পারেননি যে ওখানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে পূর্বের মানুষদের এতটা হেনস্থা হতে হবে। সেখানেও তিনি যোগ্য সমাদর পেলেন কই? তাঁর প্রতিভা উপহাসিত হল, তাঁর কৃতি উপেক্ষিত হল আর অবহেলিত হল তার চিন্তা-ভাবনা। ডঃ খুদা টেলিফোন ধরেই বলতেন, "খুদা স্পীকিং হিয়ার।" শুধু এইজন্যই তাঁকে উপহাসে জর্জরিত হতে হয়েছিল। উপহাসকারীরা বলত, "হাউ ক্যান খুদা স্পীক্?" একসময় মানসিক ভাবে এত ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে এপার বাংলায় ফিরে আসতেও চেয়েছিলেন। মতামত জানার জন্য মামুদ সাহেব ও অন্যান্য বন্ধুদের চিঠিও দিয়েছিলেন। একবার এসেছিলেন এ বাংলায়। গিয়েছিলেন তাঁর অতি প্রিয় কর্মক্ষেত্র প্রেসিডেন্সিতে। প্রেসিডেন্সির তখনকার সাম্মানিক বি-এস্-সি বীক্ষণাগার—বিখ্যাত টিনের শেডে গিয়ে বসেছিলেন। কাজুবাদাম ছিল তাঁর প্রিয়। চা ও কাজুবাদামে অভ্যর্থনা করেছিলেন তখনকার রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকেরা। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক ননীগোপাল চক্রবর্তী। অধ্যাপক চক্রবর্তীর নামে তিনি কিছু বই নিয়েছিলেন কলেজ লাইব্রেরি থেকে। সেগুলোর ব্যবস্থা হয়নি দেশ ছাড়ার সময়। হয়ত সেটাও একটা কারণ ছিল আসার। কিন্তু এ ঘটনা নিয়ে এপার বাংলার পুলিশ মহলে বেশ আলোড়ন হয়। অধ্যাপক চক্রবর্তীকেও অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়। সব মিলিয়ে এদিকে আসার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন তিনি।

তবে এসব ক্ষেত্রে একটা কথারই প্রমাণ হয়, যে ডঃ খুদা ছিলেন খুবই আবেগপ্রবণ। বিভক্ত ভারতবর্ষের দুই অংশে যে অবিশ্বাসের বীজ উপ্ত হয়েছিল তা তো ঐতিহাসিক সত্য। একে অস্বীকার করে শুধু শুধু দুঃখ পাওয়ার যুক্তি কোথায়? বুদ্ধিজীবীদেরই তো এর বিরুদ্ধে রুখে উঠতে হত। আসলে ডঃ খুদা সহজেই আহত হতেন, আর রটনায় বিশ্বাস করে নিজের মনে দুঃখ পেতেন। ডঃ খুদার বলা একটা ঘটনা নিয়ে অতি সম্প্রতি কাগজে লেখা হয়েছে। তিনি নাকি কোথায় বলেছিলেন (লিখেছেন বলে জানতে পারিনি) যে ১৯২৫-এ রসায়নের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সে বার দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বর ছিল তাঁর থেকে একশ কম। তবুও নাকি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রটি কেবলমাত্র হিন্দু বলেই কুদ্‌রতের সঙ্গে তাকে যুগ্মভাবে প্রথম বলে ঘোষণা করার চক্রান্ত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের হস্তক্ষেপে নাকি এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। ঘটনাটার সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানের কোনও শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী দুজন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের ফারাক একশ হওয়া অবিশ্বাস্য। কুদ্‌রত-এ-খুদার প্রতিভার প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখিয়েও তা বলতে হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রফুল্ল ঘোষ ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৪-এ তিনি অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৯২৪-এ তাঁর অধ্যাপনার ২০ বছর হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে টি-এস্-স্টার্লিং, জে-ডব্লিউ-হোম, প্রমুখের মতো অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে অধ্যাপক ঘোষের এতটা সামর্থ ছিল বলে মনে হয় না। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বললে ঘটনাটায় একটা স্বাভাবিকত্বের আলো পড়তে পারে। কারণ আচার্যদেব ১৯১৬-তে প্রেসিডেন্সি থেকে অবসর নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেন। ১৯২৫-এ তিনি সেখানে ছিলেন ও তাঁর ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু ঐ একশ নম্বরের ফারাকটা যে বড্ড বেশি! আর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পছন্দের পরীক্ষার্থীর পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনা বহু পুরানো। তবে সেটা কয়েক নম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য একটা সময় নাকি ছিল যে বিশেষ পরীক্ষার্থীর উপস্থিতিতে অন্যরা পরীক্ষা দিতে নিবৃত্ত হত—ফল আশানুরূপ হবে না ভেবে। ইতিহাসের খাতিরে একটা কথা বলা দরকার। কলেজের রেকর্ডে আমরা দেখছি যে ১৯২৪-এ রসায়নে কেউ প্রথম শ্রেণী পায়নি এম্-এস্-সি পরীক্ষায়। আব্দুর রউফ লিখেছেন যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকেও নাকি বঞ্চিত হতে যাচ্ছিলেন তিনি। স্যর আব্দুর রহিম তাঁর বৃত্তি পাওয়ার পথ পরিষ্কার করেন। এরকম ঘটনা আমাদের দেশে হরবখত ঘটে—আজও। একটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এর পিছনে সাম্প্রদায়িকতা ছিল কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে এখানেও তথ্য বিভ্রাট ঘটেছে। আসলে তিনি বাংলা সরকারের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে নয়।

আমার বলার কথা এই যে যেভাবেই হোক কুদ্‌রতের মনে একটা বঞ্চিতম্মন্যতার ধারণা গড়ে উঠেছিল—যা তাঁকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। এটা আরও সম্ভব হয়েছিল তাঁর অন্তর্মুখীনতার জন্য। অন্তর্মুখী কুদ্‌রত ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়াতেই সার্থকতা খুঁজে পেতেন।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বীরভূমের 'পীর' হজরত সৈয়দ শাহ্ আব্দুল মুকিদ ও মুসাম্মত ফাসিহা খাতুনের সাতটি সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে কুদ্‌রতের ছাত্রজীবন তাই আগাগোড়া সাফল্যে সমুজ্জ্বল। মারগ্রাম হাইস্কুলে এই শিক্ষাজীবন শুরু। কলকাতার উড্‌বার্ণ এম্-ই স্কুল থেকে এম--ই ও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন (১৯১৮)। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, আর ১৯২৪ পর্যন্ত পড়েন। কেউ কেউ সালটা ১৯২৫ বলেছেন। তা নয়।

যা হোক বৃত্তি নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিলেন কুদ্‌রত। লণ্ডনের ইম্পিরীয়াল কলেজ অব্ সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি থেকে তিনি ডি-এস্-সি হলেন (১৯২৯)। ডি-আই-সিও হলেন। তাঁর গবেষণার নির্দেশক ছিলেন বিজ্ঞানী জে. এফ্. থর্প। তারপর দেশে ফিরে এলেন কুদ্‌রত। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চাকুরি পেলেন না। রেকর্ড বলছে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়া পর্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে দুই-আড়াই বছর তিনি চাকুরি করেন নি। এক্ষেত্রেও অনেকে তির্যক মন্তব্য করেছেন। প্রকৃত ঘটনা না জানা গেলেও আমরা একটা ব্যাখ্যা পেতে পারি। ডঃ নীলরতন ধরের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। সাধারণতঃ সরকারী বৃত্তি পাওয়া মাত্রই প্রাপক রাজ্যের এডুকেশন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। তাই ডঃ খুদা স্বাভাবিকভাবেই B.E.S (বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস্)-এর অফিসার রূপে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর'-এর পদমর্যাদাভুক্ত হলেন। এখানে এসে যে কোনও সরকারী কলেজে এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের চাকুরি তাঁর বাঁধা ছিল। বরং সেই চাকুরি না নিলেই তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। কিন্তু বিলেতে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র বর্ধন-এর। তিনি তাঁর মধ্যে I.E.S (ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস্)-এর অন্তর্ভুক্ত হবার প্রেরণা যোগান। পরে তিনি অবশ্য I.E.S ক্যাডারভুক্তই হয়েছিলেন। এজন্যই চাকুরিতে যোগ দিতে দেরি হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে অযথা সাম্প্রদায়িকতা-বোধের প্রকাশ সন্দেহ করে আজ এই মনীষীর শতবর্ষের পুণ্যলগ্নে শিক্ষাজগতের বাতাবরণ যেন বিষবাষ্পে দূষিত না করে ফেলা হয়।

কুদ্‌রত কিন্তু এই মাঝের সময়টা বসে কাটালেন না। 'থিসিস্' জমা দিয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করলেন। এই গবেষণা কার্যে শৈথিল্য আসেনি তাঁর কোনওদিন। এই বৃত্তির সর্তানুসারে গবেষণা চালিয়ে তিনি পরবর্তীকালে 'মউয়াট' সুবর্ণ-পদক পান। এসময় তাঁর চারটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সিতে থাকার সময়ই বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন তা-ই বলা হত) শ্রী ফজলুল হক্-এর অনুরোধে ইস্‌লামিয়া কলেজ (স্বাধীনতার পরে নামান্তরিত হয়ে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ এবং আরও পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামে মৌলানা আজাদ কলেজ)-এর অধ্যক্ষপদও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। একই সাথে সব্যসাচীর মত তিনি শিক্ষকতা-অধ্যক্ষতা ও গবেষণা পরিচালনা করতে থাকেন। এসময়ে তাঁর চোদ্দটি গবেষণা-পত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি 'নেচার'-এর মত বিখ্যাত পত্রিকায় বের হয়। তাঁর কাছে গবেষণা করে শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্-সি ডিগ্রী পান। ডঃ ভট্টাচার্য পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়নের অধ্যাপক ও আরও পরে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। ডঃ খুদার অধীনে পি. এইচ্-ডি হন শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (অল্প কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করেন) ও শ্রী সুভাষ কুমার ঘোষ (প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ১৯৪৭-৫৭, ৬১-৬৭)। শ্রী ঘোষ কিন্তু 'ডক্টরেট' পান ১৯৫২-তে অর্থাৎ ডঃ খুদার পাকিস্তানে যাবার পর। প্রেসিডেন্সিতে ডঃ খুদার অন্য সহ-গবেষকদের মধ্যে ছিলেন পি. বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. মল্লিক ও এ. কে. রায়।

ডঃ খুদার গবেষণা চারটি শাখায় প্রসারিত—সাংশ্লেষণিক জৈব রসায়ন, প্রাকৃতিক উপাদান (natural products)-এর রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন এবং ফলিত ও শৈল্পিক রসায়ন। মূলতঃ তিনি জৈব-রসায়নবিদ। তাই প্রথম ক্ষেত্রেই তার অবদান বেশি, বিশেষ করে প্রথম দিকে। প্রেসিডেন্সিতে থাকতেই তিনি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঝোঁকেন। সুভাষ কুমার ঘোষ এক্ষেত্রে তাঁর সহ-গবেষক ছিলেন। নিমের উপর তাঁর প্রথম কাজ। পরে পাকিস্তানে গিয়ে তাঁর গবেষণা চমকপ্রদভাবে বহুধা-বিকশিত হয়।

প্রেসিডেন্সিতে থাকাকালীন একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। এর বিবরণ পাই রসায়নের কিংবদন্তী প্রতিম অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত আত্মজীবনী 'পেরিয়ে এলেম'-এ। ডঃ খুদা তখন প্রধান অধ্যাপক। ডঃ রক্ষিত এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে রাজশাহী থেকে এসে প্রেসিডেন্সিতে যোগ দিলেন। দুবছর আগে তার নির্বাচনের সময় ডঃ খুদাও নির্বাচক মণ্ডলীতে ছিলেন। প্রেসিডেন্সিতে এসে দুবছরের মাথায় তাঁর 'কনফার্মেশন'-এর সময় বাধল গোলমাল। এ দু বছর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত ঘটেছে। খুবই হার্দ সম্পর্ক। অথচ এবার ডঃ খুদা ডঃ রক্ষিতের বিষয়ে খুব খারাপ রিপোর্ট পাঠালেন। তিনি নাকি পড়াতে পারেন না, ব্যবহার ভালো নয় ইত্যাদি। কিন্তু তদানীন্তন ডি-পি-আই ডঃ স্নেহময় দত্ত-র উদ্যোগে গোপন তদন্ত কমিটির রায়ে ডঃ রক্ষিত-এর চাকুরি পাকা হল। এ ঘটনার পিছনের কারণ আমরা জানিনা, তবে বলা যায় এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা না ঘটলেই ভালো হত। এঁরা দুজনেই আমাদের নমস্য রসায়নাচার্য।

ডঃ খুদা ১৯৩৭-এ কলেজের বার্সার হন। আবার চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে উপাধ্যক্ষর পদ সৃষ্ট হলে ডঃ খুদা দ্বিতীয় উপাধ্যক্ষ হন। প্রথম জন ছিলেন ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (গণিতের অধ্যাপক, 'ভাস্কর' ছদ্মনামে সাহিত্য

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

রচনা করেছিলেন ও পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন)। ১৯৪৭-এ ডঃ খুদা কলেজের অধ্যক্ষের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই পদে বেশিদিন থাকেননি। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তো তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এসে তিনি এখানকার প্রথম শিক্ষা-আধিকারিক (ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাক্শন) নিযুক্ত হন। দুবছর তিনি এই পদে ছিলেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য হন। পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার পদ পান ১৯৪৯-এ। তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয় করাচিতে। এই পদে থাকাকালীন তিনি অনেকবারই ইউনেস্কো ও কমনওয়েল্থ্-এ পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়েছেন। এসময়ই তাঁর আত্মদহন তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করলেন পশ্চিমের মানুষের মনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের প্রতি কী ঘৃণা ও বিদ্বেষ! অবশ্য আগেও দুঃখ পেয়েছেন এই দেখে যে সরকার কীভাবে বাঙ্লা ভাষাকে অবদমিত রেখে উর্দু প্রচার করতে চেয়েছেন। বাঙালীদের মনে সেই যে ক্ষোভ ধিক্কার জমা হতে থাকে অন্তর্মুখী আবেগপ্রবণ ডঃ খুদা বড় বেশি করেই তার অংশী হয়ে পড়েন। ডি-পি-আই হিসাবে প্রতিবাদও করেছিলেন। কিন্তু নির্মমভাবে তিরস্কৃত ও অপমানিত হন। বলা হয় সেজন্যেই তাকে অপসারিত করা হয়। কিন্তু এখন উর্দু-ভাষীদের মধ্যিখানে এসে পড়ে তিনি মর্মপীড়ার দগ্ধ হতে থাকেন। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল ফিরে আসেন ভারতবর্ষে—পশ্চিম বাংলায়।

আবার স্বস্তির হাতছানি। প্রাক্-স্বাধীন বাংলাদেশে যে প্রশাসনিক পদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, পাকিস্তানে সে পদ অসহনীয় মনে হওয়ায় মনেপ্রাণে চাইছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরে আসতে। ফিরে এলেন। ১৯৫২-তে মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হলেন। ১৯৫৫ পর্যন্ত ছিলেন। এদিকে পাকিস্তানে 'কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR) স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষানুরাগী ও বিজ্ঞানীরা পূর্ব পাকিস্তানে এর শাখা স্থাপনের চেষ্টা করে আসছেন দীর্ঘদিন। ডঃ খুদাও এই আন্দোলনে ছিলেন। করাচিতে থাকাকালীন তিনি নিজের প্রভাব এইদিকে খাটাতে সচেষ্ট হন। শিক্ষা সংসদের সভাপতিরূপে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত কমন্ওয়েল্থ্-এর বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা বিভাগের অধিবেশনে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫-তে পাকিস্তান 'সি-এস্-আই-আর'-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা স্থাপিত হয়। ডঃ খুদা এর প্রথম ডিরেক্টর। এতদিনে সবচেয়ে মনোমত পদ পেলেন। অসীম উৎসাহে গবেষণা ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় মেতে উঠলেন। ঢাকা, রাজশাহি ও চট্টগ্রামে PCSIR-এর অধীনস্থ একাধিক গবেষণাগার গড়ে উঠল। ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন।

এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু গবেষণার কাজে শৈথিল্য আসেনি। বরং বেড়েছিল তাঁর গবেষণার নিষ্ঠা। ভারতবর্ষে থাকতে আঠার বছরে যেখানে আঠারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, সেখানে পাকিস্তানে এসে একুশ-বাইশ বছরে প্রায় আশিটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। আঠারটি বিষয়ে 'পেটেন্ট' নেন। এছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে আটত্রিশটি রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইও লেখেন। ছাব্বিশটি বই লেখেন বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে যেমন ছিল সাম্মানিক স্তরের জন্য চার খণ্ডে জৈবরসায়নের পাঠ্যপুস্তক, তেমনি ছিল একেবারে প্রারম্ভিক স্তরের পাটিগণিতের বই। ছিল কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনীর সম্ভার। আরও চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে এসবের মধ্যে কুর্-আন ও ইস্লামের উপর কয়েকটি বইও ছিল। অবশ্য এতে অবাক হবার কিছু নেই। এক সময় পরিবারের সবার ইচ্ছা ছিল কুদ্রত্ কুর্-আনে 'হেফজ' হন। তাই কুর্-আন তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন ছোটবেলাতেই। তাঁর অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে আছে বাংলা ভাষার লেখা সাতটি খণ্ডে জৈব রসায়নের 'সর্বাধুনিক' (তাঁর সময়ে) অগ্রগতির কথা; আরও বারটি জৈব, অজৈব, ও ভৌত রসায়নের বই আর কুর্-আন্-এর তৃতীয় ভাগ থেকে ত্রিংশতিতম ভাগের আলোচনা।

তাঁর রসায়নের মৌলিক গবেষণাপত্র শেষ প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে, যখন তিনি প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাঙন (ক্র্যাকিং) পদ্ধতিতে পেট্রোল তৈরির পেটেন্ট নেন। আগেই বলা হয়েছে যে অবিভক্ত ভারতবর্ষে থাকতে তিনি প্রধানতঃ সংশ্লেষণিক জৈব রসায়নে গবেষণা করেন। আর সবে শুরু করেছিলেন নিমের উপর কাজ। পাকিস্তানে এসে নিমের উপর গবেষণা আরও বিস্তৃত করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের দিশাহারা অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে তিনি রসায়নবিদ হিসাবে নিজের কর্তব্য করতে প্রয়াসী হলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়নে মাছ, পাট ও পাটকাঠি উল্লেখযোগ্য স্থান নিতে পারে—এ বিশ্বাসে তিনি মাছের উপর প্রাণ-রাসায়নিক গবেষণা শুরু করেন। মাছ সংরক্ষণের উপর তিনি গবেষণা করেছেন, গবেষণা করেছেন সস্তা খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য নির্ণয়ের উপরও। ভেষজ উদ্ভিদের উপর গবেষণা, ফল পাকানো ও এভাবে পাকা ফলের উপর প্রাণ-রাসায়নিক গবেষণা, মাছ চাষ ও মাছ ধরার সময় নির্ণয়ের উপর গবেষণা, কৃষি রসায়নের গবেষণা, মাছ রান্নার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাছের পুষ্টি-মূল্যের সম্ভাব্য পরিবর্তনের উপর গবেষণা, মৃত্তিকা রসায়নের গবেষণা ইত্যাদি বিচিত্র খাতে তাঁর

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

গবেষণা প্রতিভা শুধু যে প্রবাহিত হয়েছে তা নয়, সোনা ফলিয়েছে বিজ্ঞান-বাণীর বদান্যতার অবারিত ক্ষেত্রে। চিনি উৎপাদন, পেট্রোকেমিক্যাল ও চিটেগুড়ের ব্যবহারের উপরও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আর একটা বড় কাজ পাট ও পাটকাঠির উপর গবেষণা। বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন সময়ের পাটকাঠির ব্যবহার ও বিশেষ করে পাটকাঠি থেকে কাগজ-মণ্ড তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর কাজ দিগদর্শীর অভিধা পাওয়ার যোগ্য।

এসব কাজের জন্যই খুবই সঙ্গতভাবে তিনি অবসর গ্রহণের পরে 'বাংলা উন্নয়ন পর্যদ্'-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে আসীন থেকে তিনি দুটো কাজ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমটি গ্রামীণ অর্থনীতির সংস্কার ও দ্বিতীয়টি সাধারণ্যে শিক্ষার প্রসার। এসময়ই তাঁর মনে হয় বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখা ও প্রকাশের কথা। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনিও অনেকের মত একই ভুল করেছিলেন। বাংলায় বা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যার আলোচনা করার সময় বাংলা পরিভাষার ব্যবহার কিন্তু ছাত্রদের সাহায্য করার পরিবর্তে অসুবিধারই সৃষ্টি করে। পরিভাষা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু বিজ্ঞানকে নয়। বিজ্ঞানচর্চায় ইংরাজী বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত শব্দসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখাই শ্রেয়ঃ। বন্ধনীতে বাংলা পরিভাষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা উল্টোটি করে থাকি। অবশ্য ইংরাজী প্রতিশব্দ অনেক ক্ষেত্রে দেওয়াও হয় না। ফলে ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে গিয়ে বাংলা পরিভাষার সমার্থক ইংরাজী শব্দ না জনার জন্য অসুবিধায় পড়ে এবং আগের শিক্ষা প্রায় মাঠে মারা যায়। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের যেসব দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে সওয়াল করি, তারা কিন্তু অনর্থক দেশীয় পরিভাষা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যাক সে কথা। ডঃ খুদা যে এ নিয়ে ভেবেছিলেন—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন এটা কিন্তু অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু কোনও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। একসময় বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত পরিভাষা পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল—যার মূলে ভাষাতত্ত্বগত ত্রুটিমুক্তি অপেক্ষা ধর্মীয় গোঁড়ামিই বেশিমাত্রায় প্রশ্রয় পেয়েছিল। ডঃ খুদা কিন্তু এর উর্ধে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক আশিস্ সিন্‌হা ('গবেষণা' পত্রিকার সম্পাদক) এ বিষয়ে তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বর্তমান লেখককে বলেছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে ডাঃ খুদা এখানে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক প্রতিনিধি এই সংস্কারের কথা তুলে উদাহরণস্বরূপ বলেন যে তাঁরা 'রামধনু' কথাটির পরিবর্তন চান। ডঃ খুদা বিরক্তির সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দেন, বলেন যে এখানে 'রাম' বিশেষণ 'বড়' অর্থে প্রযুক্ত। আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে একথার যাথার্থ ব্যাখ্যা করেন। সাংবাদিকদের কাছ ত্রুটি স্বীকারও করেন তিনি।

কিন্তু এখানেই পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনরের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। উর্দু-ভাষীরা এটাকে সুনজরে দেখল না। তাঁকে পদত্যাগ করতে একরকম বাধ্য করা হল। কিন্তু এ বলিদান অসংখ্য বাঙালীর ছোট বড় বিরাট অসংখ্য আত্মত্যাগের একটি কণা মাত্র। ততদিনে বাঙালী বুঝে গেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকার গুরুত্ব। বুঝেছে দেশ যেমন মা, ভাষাও আরেক মা। এই বোধের ফলশ্রুতি হিসাবেই বাঙালী ভায়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে অনুসরণ করে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের তৈরি পথে রক্তের প্লাবন ঠেলে এল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সেটা ১৯৭১ সাল। বাঙালী দেশগঠনে নামল নতুন উদ্দীপনায়। ডঃ খুদার বয়স তখন ৭১। ডাক পড়ল তাঁরও। তিনিও এগিয়ে এলেন পরম উৎসাহে তাঁর পছন্দের ক্ষেত্রে। শিক্ষা কমিশনের সভাপতি করা হল তাঁকে। খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে এসময়। বিরাট সংখ্যক শিক্ষাব্রতী নিহত হয়েছেন খান সেনাদের হাতে। বীভৎস চণ্ডনৃত্যের চিহ্ন ছড়ানো সারা দেশে। যাবার সময় খান সেনারা পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। বাজার অগ্নিমূল্য। ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর কান্না ও আর্তনাদ। এর মধ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন কাজ। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তখন যেসব কর্মীপুরুষ দৃঢ়চিত্তে দাঁড় বেয়ে শেখ সাহেবের হাল ঠিক রাখতে সাহায্য করেছেন ডঃ খুদা তাঁদের অন্যতম ও অগ্রগণ্য। চার বছর ধরে কাজ করে তিনি সরকারের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার পরিকল্পনা ও রূপরেখা দিয়েছিলেন তিনি। এই বয়সে এত পরিশ্রম—ভাবা যায়! খুবই সঠিকভাবে তাঁর উপর বর্ষিত হল 'একুশে পদক'-এর সম্মান—১৯৭৬ সালে। ১৯৭৫ থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক অধ্যাপক ছিলেন।

কিন্তু বঞ্চনা তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, "আমার মতে তিনিই প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। আমি নিজেকে কখনো তাঁর চেয়ে বড় মনে করি না। তবে সমান মনে করি।" কিন্তু ডঃ খুদা জাতীয় অধ্যাপক হননি। বাংলা দেশের বিশিষ্ট পদার্থবিদ অধ্যাপক এম. ইন্নাস আলি তাঁর সম্বন্ধে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, "এদেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর নিকট থেকে বৈজ্ঞানিক কর্মচেতনা ও বিজ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ...তিনি বিজ্ঞানীদের পেশাগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত মন উন্নয়নের জন্য (বিশেষ করে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের জন্যে) সর্বদা দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়েছেন। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের সাথে দেখা হলেই তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল এদেশের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।" কাজী মোতাহার হোসেন অকপটে বলেছেন যে সরকার ডঃ খুদার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করে নি। বিশিষ্ট রসায়নবিদ ও বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ মফিজুদ্দিন আহ্‌মদ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি তাঁর গবেষণার কাজ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তিনি বিচরণ করতেন। আমি মনে করি তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রের এই ব্যাপকতা ঐ সময়ে জাতির জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ ছিল। শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করলে তিনি বৈজ্ঞানিক হিসাবে আরও বেশি খ্যাতি লাভ করতেন। ব্যক্তিগত উন্নতি হত। কিন্তু দেশ ও জাতি তাঁর অবদান থেকে বঞ্চিত হত।" এই কথা আমরাও আগে বলেছি। তাঁর কাজের মূল লক্ষই ছিল ভেঙে পড়া দেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন। একবার নয় দু-দুবার। রসায়নবিদ হিসাবে তিনি তাঁর করণীয় করেছেন—সাধ্যের অতিবিরক্ত ভাবেই। এখানেই তাঁর মহত্তম বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের গজদন্তমিনারে তিনি বসে থাকতে চাননি। চাননি বিজ্ঞানীর উন্নাসিকতায় মানববিদ্যার সৌকর্যকে অবহেলা করতে। বরং আগ্রহী হয়েছেন মানব মনীষার স্ফুরণ ও বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ডঃ আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দিন দীর্ঘদিন ডঃ খুদার সাহচর্য পেয়েছেন, খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁকে। তিনি বলছেন, "তিনি সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে তিনি সোচ্চার ছিলেন। অনেক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিশু-কিশোর প্রতিষ্ঠানকে তিনি সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা দান করেছেন।"

তিনি আরও লিখেছেন, "তাঁর (ডঃ খুদার) প্রধান কৃতিত্ব বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার পথিকৃৎ হিসাবে। দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। তাঁর সুতীক্ষ্ণ লেখার মাধ্যমে তিনি জনমনে এ আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

তবে তিনি যে বাংলা ভাষার অক্ষরের রূপান্তর চেয়েছিলেন, রোমান অক্ষরের অনুকরণে তাঁর পরিকল্পিত সেই লিপ্যন্তর প্রস্তাব বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পায়নি। পাওয়া সম্ভবও ছিল না বোধ হয়। তাঁর স্পষ্টবাদিতা তাঁকে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। শিক্ষাব্রতীদের এ এক বৈশিষ্ট্য। তাঁরা মনে করেন স্পষ্টবাদিতা মানুষের গুণ। আর প্রশাসন যখন ক্রুদ্ধ হন, তাঁরা ব্যথা পান। ডঃ খুদার ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। তবে তাঁর সবচেয়ে ব্যথা লেগেছিল এই দেখে যে বাংলা ভাষার সসম্মান প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে যে রাষ্ট্রের জন্ম, সেখানেও বাংলা ভাষায় লেখা এতগুলি রসায়ন চর্চার বইয়ের প্রকাশক জুটল না কেন। কিন্তু আমরা তো জানি ভারতবর্ষ থেকে জনপ্রিয় বাংলা ভাষায় লেখা পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশের ছাত্রদের কাছে গিয়ে আদৃত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬৪-৬৫-তেও ডঃ খুদার লেখা 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী' অসমীয়ায় অনূদিত হয়েছে, উর্দুতে অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে 'সায়েন্স কি অনোখী কহানী' নামে।

প্রশ্ন জাগে মনে, বারে বারে অবিচারের শিকার হয়ে তিনি জীবনের প্রান্তে এসেও স্থিরচিত্তে কাজ করে গেছেন কী করে। যখন তিনি অধ্যাপক জে. এফ. থর্পের কাছে কাজ করতে গিয়েছিলেন, কোন সাহায্য পাননি নির্দেশকের কাছ থেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নাকি একটি নিবন্ধে অধ্যাপক থর্পের সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করেছিলেন। কুদ্‌রত প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র, তাই এই অনীহা। নিজের অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই হেনস্থা। এর উত্তর পাই ডঃ খুদার দ্বিতীয় মেয়ে হোসনে আরা বেগমের কথায়। ডঃ খুদা যশস্বী বৈজ্ঞানিক হয়েও অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। কুর্-আনে ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। ইসলামকে তিনি জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন। প্রকৃত মুসলমানরা বলেনও তাই—ইসলাম ধর্ম নয়, এ জীবনচর্যা। ইসলাম-এর সম্যক উপলব্ধির জন্য তিনি কুর-আন অধ্যয়ন করেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। এই ধর্মভাবই তঁকে অসীম ধৈর্য, স্থৈর্য ও মানবপ্রেমের অধিকারী করেছিল। কুর্-আন অধ্যয়ন করেই তিনি বুঝতে পারেন যে সাধারণ মুসলমান এর তাৎপর্য বোঝে না বলেই সাম্প্রদায়িকতা বোধের শিকার হয়। তাই তিনি কুর-আন শরীফ অনুবাদে ও বাস্তব ব্যাখ্যায় হাত দিয়েছিলেন। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করাও তাঁর কাছে ধর্মীয় আরাধনার সমতুল্য ছিল। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস তাঁর মনে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম দিয়েছিল। তা-ই তিনি ছড়াতে চেয়েছেন আশেপাশের মানুষের মধ্যে—মৃত্যুর দিন (৩রা নভেম্বর, ১৯৭৭) পর্যন্ত।

জন্মশতবর্ষে এই অমিত উৎসাহী বিজ্ঞানী, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক, উদারচেতা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মনীষীর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ স্মৃতিতর্পণ।

---

*রসায়ন (১৯৫৯-৬১)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073